পড়াশোনার ক্রোড়পত্র

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭

# উত্তরণ

৮ পাতার এই রঙিন ক্রোড়পত্রটি যুগশঙ্খ-র সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত

# সময়ের গুরুত্বই সাফল্যের চাবিকাঠি

**তন্ময় মণ্ডল**

Lost time can never be found again. ' ইংরেজিতে প্রচলিত এই কথাটি চিরন্তন সত্য। সময় কখনও থেমে থাকে না। তাই সময়ের কাজ সময়ে করার অভ্যাস গড়ে তোলাটা খুবই জরুরি। ছাত্রজীবনে এই অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য আদর্শ সময়। জীবনে সাফল্যের শিখর ছুঁতে গেলে এই অভ্যাস তৈরি করতেই হবে। নিয়মানুবর্তিতা এবং সময়ের কাজ সময়ে করার সুঅভ্যাস তৈরি হলেই মানুষ তাকে বিশ্বাস করবে, শ্রদ্ধা করবে এবং ভেবে নেবে সে অন্যদের সময়ের মূল্যায়ন করতে জানে। সফল মানুষেরা তাদের সময়কে সবচেয়ে মূল্যবান মনে করে থাকেন। প্রতিটি মানুষেরই মেধা রয়েছে। তবে কেউ তা ব্যবহার করে সফলতার দিকে অগ্রসর হন, কেউ বা তা ব্যবহার না করে বিফলতার পথ বেছে নেন। ক্লাসের সবাই ভালো ছাত্র হতে পারে না। আর ভালো ছাত্র হয়ে ওঠা জীবনের জন্য কতটা জরুরি, এটা বুঝতেও অনেকের পুরো ছাত্রজীবনটাই পার হয়ে যায়। তবে মেধাই শেষ কথা নয়, নির্দিষ্ট প্ল্যানিং আর সময়ের ঠিকঠাক ব্যবহার করতে না জানলে পিছিয়ে পড়তেই হবে। প্রথমত লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা, তারপর নিয়ম করে প্ল্যানিং বা রুটিন অনুযায়ী এগিয়ে যাওয়া, আর তার মানে মোদ্দা কথা হল কোনও কাজ বা পড়া ফেলে না রাখা।

সময়ের সঙ্গে নিজেকে সুসংগঠিত করে তুলতে পারলে আত্মবিশ্বাস বাড়বে যা জীবনে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অক্সিজেনের মতো কাজ করবে। বিশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থায় কখনও সফলতা আসে না। আজকের পড়া ফেলে রাখলে তা কালকের পড়ার সঙ্গে পড়তে হবে নতুবা ওটি আর পড়াই হবে না। ক্রমে ক্রমে পড়া জমতে জমতে পড়াশোনা একসময় বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তখন হারিয়ে যাবে আত্মবিশ্বাস। চেনা বিষয়কেও অচেনা মনে হবে।

যে ছাত্র একটি সুন্দর রুটিন মেনে চলে সে ভালো না হয়ে পারে না। দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্রাংশকেও ভেঙে সাজাতে হয়। আসলে প্রতিদিন নতুন নতুন পড়া বা কাজ করতে হচ্ছে, ফলে গতকালেরটা যদি ফেলে রাখা হয় তাহলে তীব্র সমস্যা তৈরি হবেই। অনেকে রুটিন বানায়, কমিটমেন্টও করে কিন্তু সময়কে গুরুত্ব দেয় না বলে কমিটমেন্ট দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে দুর্বল হতে হতে একটা সময় সেই কাজটির গুরুত্ব সঠিকভাবে অনুধাবন করা দায় হয়ে যায়, আর তখনই অনিশ্চয়তা এসে হাজির হয় চূড়ান্ত ফলাফল নিয়ে।

বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন বলেছিলেন, 'ব্যস্ত থাকা মানেই কাজ করা নয়। যে কোনও কাজের উদ্দেশ্য হল, কিছু একটা উৎপাদন করা অথবা অর্জন করা। এই অর্জন করার জন্য অবশ্যই আগে থেকে চিন্তা করতে হবে এবং তার ধারণা থাকতে হবে কাজটি কীভাবে করা হবে। আর সিস্টেম, পরিকল্পনার সঙ্গে চাই সময় সম্পর্কে সম্যক ধারণা এবং থাকতে হবে সৎ উদ্দেশ্য এবং পরিশ্রম করার মানসিকতা। ছাত্রজীবনে ভালো ফলাফল করতে হলে সঠিক নিয়মে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। পড়াশোনার ব্যাপারে কৌশলী ও নিয়ম মেনে চলতে হয়। Robinson অধ্যয়নের শ্রেষ্ঠ নিয়মাবলি প্রণয়ন করেছেন। তার পদ্ধতিকে বলা হয় SQ3R পদ্ধতি। এর পূর্ণরূপ হল Survey (জরিপকর),

*এরপর চারের পাতায়*

দু'য়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
বাদ্যযন্ত্র
তিনের পাতায়
স্পেশাল টিউশন
কম্পিউটার ও ইংলিশ গ্রামার
চারের পাতায়
ক্লাস সেভেন-এর টিউশন
ভূগোল
ক্লাস এইট-এর টিউশন
বিজ্ঞান
পাঁচের পাতায়
ক্লাস নাইন-এর টিউশন
ইতিহাস
ক্লাস টেন-এর টিউশন
ভূগোল
ছয়ের পাতায়
জেনারেল নলেজ
নাইট্রোজেন চক্রের কথকতা
সাতের পাতায়
ক্যুইজ
বিতর্ক
আটের পাতায়
জেনারেল নলেজ
রোলস রয়েস গাড়ির ইতিহাস

## শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

# ভয়ে নয়, ভালোবেসে পড়বে

**কবিতা দাস** ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা
হরকিশোর হাইস্কুল, হাইলাকান্দি

বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেই পড়াশোনা নিয়ে একটা ভীতি লক্ষ করা যায়। এরজন্য আমরা শিক্ষক ও অভিভাবকরা অনেকটাই দায়ী।

প্রতিযোগিতার ইঁদুরদৌড়ে আমরা সবাই নম্বরের পিছনে ছুটছি। অনেক সময় অভিভাবকরা বুঝতে পারেন না তাঁর সন্তানের মস্তিষ্কে পড়াশোনা ধরে রাখার ক্ষমতা কতটুকু। অতিরিক্ত চাপ কখনও কখনও তার উপরে বর্তায়। নিজের জীবনের ব্যর্থতাটুকু পূরণ করতে চান সন্তানের উপরে। তা অনেক সময় সন্তানের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। সেখান থেকেই জন্ম নেয় পড়াশোনার প্রতি ভয় এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব। ছোট ছোট শিশুদের পিঠে বইয়ের বোঝা দেখলে নিজেদেরই কষ্ট হয়। শৈশবটা প্রাণখোলা আনন্দে কাটে না। পড়া নামক বিষয়টির প্রতি অজানা ভয় অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীদের গ্রাস করে ফেলে। ফলে পড়াশোনার প্রতি অনীহা জন্মায়। দারিদ্রসীমার নীচে কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলে আসে মধ্যাহ্ন ভোজনের আশায়। পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ নিয়ে নয়। কাজেই শিক্ষক-শিক্ষিকা হিসেবে আমাদের দায়িত্ব স্কুলে যতটুকু সময় আমরা তাদের পাই ততটুকু সময় বিভিন্ন আলোচনার মাধ্যমে পড়াশোনার প্রতি তাদের আগ্রহ বাড়ানো। একই পন্থা বাড়িতে অভিভাবকদেরও মেনে চলা উচিত। আমার শিক্ষক-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলছি ছোটবেলা থেকে

*এরপর তিনের পাতায়*

## উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান

# মুখস্থ করার পর লিখলে ভালো মনে থাকে

**সায়ন কর** অষ্টম শ্রেণি,
রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশন বিদ্যাভবন

দু'চোখে একরাশ স্বপ্ন নিয়ে জীবনের পথে এগিয়ে যেতে চায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ মিশন, বিদ্যাভবনের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র সায়ন কর। চলার পথে সায়ন তার পাশে পেয়েছে বাবা-মা ও মিশনের মহারাজদের আশীর্বাদ ও ভালোবাসা। বড় হয়ে নিজের কাজের মাধ্যমে মানুষকে উন্নতমানের পরিষেবা দিতে আগ্রহী সায়ন।

উত্তরণ: নতুন ক্লাসে কি তুমি প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হয়েছ?

সায়ন : আমাদের স্কুলে ওইভাবে প্রথম স্থান বলে কিছু হয় না। তবে প্রত্যেক শ্রেণিতে রেজাল্টের মানের ওপর ভিত্তি করে রোল নম্বর ওয়ান হিসাবে একজন করে বিবেচিত হয়। এই সেকশনে আমি রোল নম্বর ওয়ান।

উত্তরণ : তোমার পড়াশোনার সময় কখন?

সায়ন: সকাল সাড়ে নটা থেকে বিকেল সাড়ে চারটে পর্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা করি। বাড়ি এসে একটু বিশ্রাম নিয়ে রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করি। তবে বেশি রাত নয়। সকালে আবার টিউশন যেতে হয়।

উত্তরণ: কোন কোন বিষয় টিউশন নাও?

সায়ন: ইংরেজি, অঙ্ক ও বিজ্ঞান। বাকি বিষয় আমি মায়ের কাছে বাড়িতে পড়ি।

উত্তরণ: তোমার প্রিয় বিষয় কী?

সায়ন: অঙ্ক ও ইংরেজি।

উত্তরণ: পড়াশোনার বিষয়ে সবথেকে বেশি কে তোমাকে সাহায্য করেন?

সায়ন: মহারাজরা আমাকে ভীষণভাবে সাহায্য করেন। এছাড়া আমার বাবা-মা, গৃহশিক্ষকদের কাছেও খুব সাহায্য পাই।

উত্তরণ: বড় হয়ে কী হতে চাও?

সায়ন: ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই। পাশাপাশি মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই। সেবামূলক কাজ করতে চাই।

উত্তরণ: অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু বলো।

সায়ন: সবাইকে বলব ভালো রেজাল্ট করতে হলে শুধু নোটস পড়লেই হবে না। সেইসঙ্গে পাঠ্য বইগুলিও ভালোভাবে পড়তে হবে। এছাড়াও যে বিষয়টি পড়ছি সেটি মুখস্থ করার পর লেখার অভ্যাস করলে সেটি ভালোভাবে মনে থাকবে।

উত্তরণ: তোমার জীবনের অনুপ্রেরণা কে?

সায়ন: আমার বাবা-মা এবং অবশ্যই শিক্ষকেরা।

উত্তরণ: ভবিষ্যতের দিনগুলি তোমার আরও উজ্জ্বল হোক, তুমি আরও বড় হও।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭



# বাদ্যযন্ত্র

বাদ্যযন্ত্র বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট হল সেই বস্তু যার দ্বারা বা যাকে বাজিয়ে সুর সৃষ্টি করা হয়। বাদ্য অর্থাৎ বাজনা, আর যন্ত্রকে সহজ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় মেশিন। বাদ্যযন্ত্রকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছে যাতে তা সুরের সৃষ্টি করতে পারে এবং গানের সহায়ক হিসাবে একে ব্যবহার করা যায়। বলা যায় মানব সভ্যতা যেদিন থেকে শুরু হয়েছে মোটামুটি তখন থেকেই এই বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। আবার নতুন অনেক বাদ্যযন্ত্র তৈরিও করেছে মানুষ নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে। তবে প্রথমদিকে এই বাদ্যযন্ত্র বা মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট ধর্মীয় গান করার সময়েই ব্যবহার করা হত। এছাড়া নানারকম আচার-অনুষ্ঠানে এর ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া গেছে ইতিহাসে। তবে সেক্ষেত্রে কিছু নিয়ম ছিল সেটা হল অনুষ্ঠান অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্র নির্দিষ্ট করা ছিল। একটি নির্দিষ্ট রকম বাজনা ব্যবহার করা হত। কিন্তু আস্তে আস্তে মানুষ তার পছন্দে পরিবর্তন নিয়ে আসে। বিভিন্ন ইনস্ট্রুমেন্টের মিলিত সুর নিয়ে তারা এক্সপেরিমেন্ট করতে থাকে। আজকের ভাষায় যাকে বলে ফিউসন। ধীরে ধীরে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহারে পরিবর্তন আসে। কোনও উপলক্ষ ছাড়া শুধু নিজের ভালোলাগার জন্যেও মানুষ নানা বাদ্যযন্ত্র বাজায়।

কিছু ঐতিহাসিক যে যন্ত্রটাকে প্রথম বাদ্যযন্ত্র হিসাবে অনুমান করেছেন সেটা হল একটা বাঁশি। যার বয়স আনুমানিক প্রায় ৬৭০০০ বছর। এই বয়স নিয়ে যদিও বিতর্ক আছে। কারও কারও মতে, সবথেকে প্রাচীন বাঁশির বয়স ৩৭০০০ বছর। তবে এই মতভেদ দেখে এই কথা নিশ্চিত করে বলা যায় যে বাদ্যযন্ত্রের নিশ্চিত বয়স বলা সম্ভব না। ইতিহাস ঘেঁটে এ-কথার অনেক ক্ষেত্রেই প্রমাণ পাওয়া গেছে যে বাদ্যযন্ত্র তৈরি করার জন্য উপকরণ হিসাবে পশুর চামড়া, হাড়, কাঠ এইসব ব্যবহার করা হত।

প্রথমদিকে পৃথিবীর একেকটি অঞ্চলে একেক রকম গানের ধরন অনুযায়ী বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি হয় এবং তার ধীরে ধীরে উন্নতিও হয়। এরপর সভ্যতার মিলনের সঙ্গে সঙ্গে এই বাদ্যযন্ত্রও এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন কালচারের সংমিশ্রণে সংস্কৃতির সঙ্গেও এই যন্ত্রের সংমিশ্রণ ঘটে। মধ্যযুগীয় সময়ে মেসোপটেমীয় বাদ্যযন্ত্রসমূহ প্রচলিত ছিল সমুদ্র তীরবর্তী দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে। আবার ইউরোপীয়ানরা বাজাত উত্তর আফ্রিকান বাদ্যসমূহ। আমেরিকান অঞ্চলগুলোতে যদিও বাজনার উন্নতি সেভাবে হয়নি। কিন্তু উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে বাজনা আদানপ্রদান করার রীতি ছিল। ১৪০০ সালের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে এই বাজনার উন্নতি একেবারেই কমে আসে। সিন্ধু সভ্যতায় বেনু, বীণা ও মৃদঙ্গের ব্যবহার ছিল বলে জানা যায়। বৈদিক যুগে দুন্দুভি ও ভূমি দুন্দুভির ব্যবহারের নমুনা পাওয়া যায়।

গঠন ও উপাদানগত দিক থেকে বাদ্যযন্ত্রকে চারভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল তত, শুষির, ঘন ও আনদ্ধ। তত যন্ত্রগুলোতে তার থাকে, যেগুলো ফুঁ দিয়ে বাজানো হয় সেগুলো শুষির, কোনও ধাতু দিয়ে যখন বাজনা তৈরি করা হয় তখন তাকে বলে ঘন আর চামড়ার তৈরি যন্ত্র হল আনদ্ধ। তত ও শুষির যন্ত্র গানের সঙ্গে বা অন্য যন্ত্রের সঙ্গে বাজানো যায় আবার শুধুও বাজানো যায়, তাই একে স্বয়ংসিদ্ধ যন্ত্র বলে। যেমন সেতার, সারোদ। ঘন ও আনদ্ধ কেবল গান ও অন্যান্য যন্ত্রের সঙ্গেই বাজানো যায়, একা বাজানো যায় না।

বাদ্যযন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে পেশার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছে যেমন সাপুড়েরা তুবড়ি বাজিয়ে বা বীণ বাজিয়ে সাপের খেলা দেখায়, বাজিকররা ডুগডুগি বাজিয়ে বানরের খেলা দেখায়। সার্কাসের জোকাররা পায়ে ঘুঙুর পরে মজা করে। আবার ফেরিওয়ালারা হাতে ঘুঙুর বাজিয়ে জিনিস বিক্রি করে। খঞ্জনি বাজিয়ে বৈষ্ণবী ভিখারিরা ভিক্ষা করে।

বাদ্যযন্ত্রকে কেন্দ্র করে নানা রকম মানুষের বিশ্বাসও আছে। শঙ্খ ও সানাইয়ের আওয়াজ হিন্দুরা শুভ বলে মানে। আবার রাতে বাঁশি বাজানো সাধারণ লোকের মতে অশুভ। এভাবেই বাদ্যযন্ত্র মানুষের রোজকার জীবনে ঢুকে গেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে পুজো বা শাঁখ বাজানো আমাদের নিত্যপুজোর অংশ।

আজ আমরা এরকমই কিছু চেনা ও কম চেনা বাজনা নিয়ে সাধারণ কিছু কথা জানব।

বেনা: বেনা যন্ত্রের গঠন ও বাদনরীতি কিছুটা বেহালার মতো। নারকেলের অর্ধাকার একটি মালাই বাঁশের দণ্ডের সঙ্গে বেঁধে এটি তৈরি করা হয়। মালাইয়ের উপরের দিকে থাকে চামড়ার ছাউনি। ঘোড়ার লেজের চুলের তৈরি ধনুকের মতো ছড় দিয়ে এই বেনা বাজানো হয়। রংপুর ও দিনাজপুরে কুশান ও কেচ্ছা গানে এই বাজনার ব্যবহার করা হয়।

বাঁশি: এর প্রাচীনতার কথা আগেই হয়েছে। এর আবার নানা রকম প্রকারভেদ আছে। কদ বাঁশির মাথা তেরচা ভাবে কেটে কাঠের পাতলা খিল আঁটা হয়। সেখানে সামান্য ছিদ্র থাকে তাতে ফুঁ দিলেই বাজে। এর নীচে চৌকো একটা হাওয়া বেরনোর জায়গা থাকে। অঞ্চল ভেদে এই বাঁশির নানা রকম নাম আছে মুখে পুরে বাজাতে হয় বলে একে মুখবাঁশি বলে উত্তরবঙ্গে। মুখের কাছে খিল থাকে বলে ফরিদপুরে একে খিলবাঁশি বলে। মুখটা অনেকটা কলমের মতো দেখতে বলে একে কলমবাঁশিও বলে।

জুড়ি: এটি আসলে কাঁসার তৈরি দুটো বাটি। এর মাঝখানে ছিদ্র করে মোটা সুতোয় বেঁধে দুটো বাটির মুখে টোকা দিয়ে বাজানো হয়। বাজানোর সময় বাটির গায়ে হাত লাগানো যায় না, এতে বিকৃত আওয়াজ হয়। জুড়ি একাধারে তাল, লয় ও ছন্দ নিরুপণে সাহায্য করে। লোকসংগীত ও উচ্চাঙ্গসংগীতে জুড়ির ব্যবহার থাকে।

করতাল: এটা পেতলের থালার মতো একটা যন্ত্র। এটিকে বাজানোর রীতি জুড়ির মতোই। কড়তালের সুতো তর্জনীতে জড়িয়ে দু'টি প্লেটে টোকা দিয়ে এটি বাজানো হয়। কীর্তনের সময় করতালের ব্যবহার না হলে চলেই না।

সেতার: সেতার বিশ্বের সবথেকে পরিচিত বাদ্যযন্ত্র ভারতীয় উপমহাদেশের। এটা অনেকটা তানপুরার মতো দেখতে। তুম্বা ও ডান্ডি সমেত সেতারে কম-বেশি ১৭টি তার থাকতে পারে। তিনটে তার থাকে বাজানোর জন্য। যেগুলোর 'মা সা পা'-তে সুর বাঁধা থাকে। চতুর্থটি থাকে খরাজের 'সা'-তে সুর বাঁধা। এরপর থাকে তিনটি সংগতকারী তার। এছাড়াও ৯ থেকে ১৩টা থাকে মূর্ছনা ধরে রাখার জন্য। অনেকটা চাবির মত দেখতে কুন্তি দিয়ে এই তারগুলোকে আটকে রাখা হয়। মোগল সাম্রাজ্যের শেষদিকে সেতারের প্রচলন হয়। মোগল সাম্রাজ্যের রাজ দরবারে পারসিয়ান ল্যুট নামে এক বীণা জাতীয় বাদ্যযন্ত্রও বাজানো হত।

সরোদ: সরোদ চোদ্দো থেকে সতেরো শতকের মধ্যে বহুল ব্যবহৃত একটি বাজনা। এটি লিউটের মতো ভারতীয় একটি তারের যন্ত্র। এটি মুলত ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে ব্যবহার করা হয়। সেতারের মতো সরোদ হিন্দুস্তানী শাস্ত্রীয় সংগীতে সবথেকে জনপ্রিয়। কারও কারও মতে আফগানিস্তানের রুবার আর মধ্য এশিয়ার সরোদ একই। সরোদ শব্দটির ফারসি ভাষায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় সুর বা সুন্দর আওয়াজ। এছাড়াও সরোদকে খাদ রুবার হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭

## স্পেশাল টিউশন: কম্পিউটার

# পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড শো

(আগের টিউশনের পর)

স্লাইডে শব্দ ও ভিডিও যোগ করা

প্রেজেন্টেশন তৈরির সময় স্লাইডে বিভিন্ন শব্দ, যেমন: কথা, গান, আওয়াজ ইত্যাদি এবং বিভিন্ন অডিও ও ভিডিও ক্লিপ যুক্ত করে স্লাইড প্রেজেন্টেশনকে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। এর জন্য কম্পিউটার ডিস্কে বিভিন্ন সাউন্ড বা ভিডিও ক্লিপ ফাইল সংরক্ষিত থাকতে হবে।

স্লাইডে শব্দ যোগ করা:

স্লাইডে যে সব সাউন্ড ফরম্যাট যুক্ত করা যায়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল .wav, .mp3, .midi, .mpeg, .avi ইত্যাদি। পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে বিভিন্ন ভাবে সাউন্ড বা শব্দ যোগ করা যায়। যেমন: Disk থেকে, CD থেকে, Audio Track থেকে, Clip Organizer থেকে এবং সর্বোপরি Sound Recording-এর মাধ্যমে।

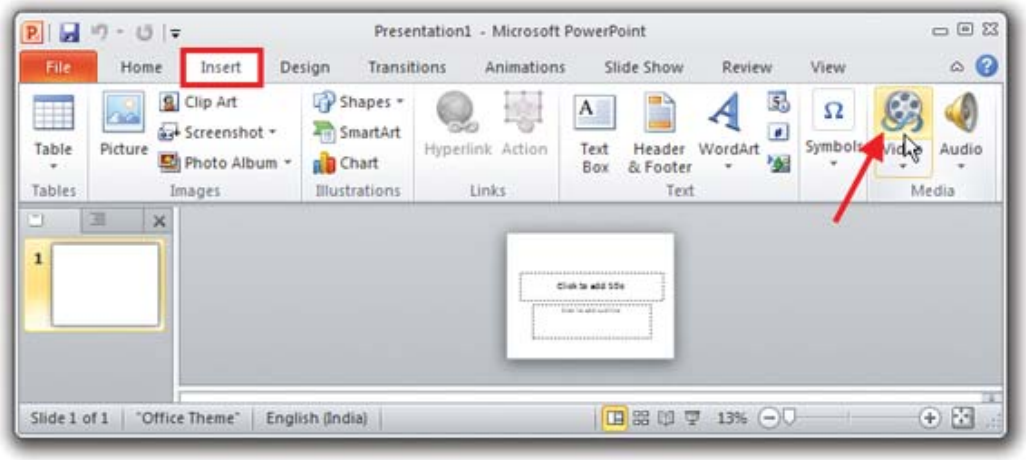


পদ্ধতি: ১) Insert রিবনের Media Clip কমান্ড গ্রুপের Sound লেখা বাটনে ক্লিক করলে Insert Sound ডায়ালগ বক্সের স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে।

২) এবার Disk Driveএ সংরক্ষিত অডিও ফাইল নির্দিষ্ট ফোল্ডার থেকে নির্বাচন করে Ok বাটনে ক্লিক করতে হবে। এর ফলে নির্দিষ্ট অডিও সাউন্ড স্লাইডে সংযোজিত হবে।

ক্লিপ অর্গানাইজার থেকে সাউন্ড যোগ করা:

পদ্ধতি: ১) Insert রিবনের Media Clip কমান্ডগ্রুপের Sound বাটনের অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করে প্রাপ্ত তালিকা থেকে Sound from Clip Organizer অপশনে পুনরায় ক্লিক করতে হবে।

২) এরপর Clip Art ডায়ালগ বক্স Task Pane-এ প্রদর্শিত হবে। ক্লিপ আর্ট গ্যালারিতে উপস্থিত বিভিন্ন Media File প্রদর্শিত ( Claps Cheer, Telephone ইত্যাদি) হবে।

৩) গ্যালারি থেকে যে কোনও Media File বা Sound-টি সিলেক্ট করতে হবে। এর ফলে Microsoft Office Power-point ডায়ালগ বক্স স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে। এই ডায়ালগ বক্সে Automatically এবং When Clicked দুটি বাটন দেখাবে। Automatically বাটনে ক্লিক করলে Slide Show-এর সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভিডিওটি শুরু হবে। When Clicked অপশনে ক্লিক করলে Slide Show-এর সময় মাউস ক্লিক করার পর শব্দ শোনা যাবে।

স্লাইডে ভিডিও যোগ করা:

Insert রিবনের Media Clips কমান্ডগ্রুপের Movie বাটনের ড্রপ ডাউন অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করলে Movies from file এবং Movie from Clip Organizer অপশন দুটি প্রদর্শিত হবে।

১) Insert রিবনের Media Clips কমান্ডগ্রুপের Movie বাটনের ড্রপ ডাউন এরো চিহ্নে ক্লিক করে Movie from file অপশনটি নির্বাচন করতে হবে অথবা কি-বোর্ডের Alt+NVF কি-গুলি চাপলে Insert Movie ডায়ালগ বক্স স্ক্রিনে প্রদর্শিত হবে।

২) এরপর কম্পিউটার ডিস্ক ড্রাইভে সংরক্ষিত মুভি ফাইলটি নির্দিষ্ট ফোল্ডার থেকে সিলেক্ট করে Ok বাটনে ক্লিক করতে হবে।

৩) এরপর Microsoft Office Powerpoint ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। প্রদর্শিত এই ডায়ালগ বক্সে Automatically বাটনে ক্লিক করলে Slide Show-এর সময় মুভি স্বয়ংক্রিয়ভাবে শুরু হবে। যদি When Clicked বাটন নির্বাচন করা হয়, তবে মাউস ক্লিক না করা পর্যন্ত মুভি শুরু হবে না।

ক্লিপ অর্গানাইজার থেকে ভিডিও যোগ করা:

১) Insert রিবনের Media Clips কমান্ডগ্রুপের মুভি বাটনের ড্রপ ডাউন অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করে Movie from Clip Organizer অপশনটি নির্বাচন করতে হবে। অথবা কি-বোর্ডের Alt+NVM কি-গুলি চাপতে হবে।

২) Task Pane এ Clip Art ডায়ালগ বক্স প্রদর্শিত হবে। এই ডায়ালগ বক্সে Selected Media File types লেখা টেক্সট বক্সের ড্রপ ডাউন অ্যারো চিহ্নে ক্লিক করে প্রদর্শিত তালিকায় Movie চেক বক্সে ক্লিক করলে বিভিন্ন ভিডিও ক্লিপস প্রদর্শিত হবে।

৩) প্রদর্শিত যে কোনও Movie Clip-এ ক্লিক করলে ক্লিপটি স্লাইডে Insert হবে।

**কম্পিউটারের স্পেশাল টিউশনে তোমরা কী কী শিখতে চাও জানিয়ে মেইল করো**

## স্পেশাল টিউশন: ইংলিশ গ্রামার

# Future Tense

(আগের টিউশনের পর)

Future Indefinite Tense

ভবিষ্যতে কোনও কাজ ঘটবে এরকম বোঝালে Future indefinite tense হয়

বোঝার উপায়

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে বে, ব, বা, বি, বেন এদের যে কোনও একটি উল্লেখ থাকে।

বাক্যের গঠন: Subject + shall/will + verb + object

Subject-এর পর person ও number অনুসারে shall বা will বসে এবং মূল verb-এর present form ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ :

আমি কাজটি করিব- I will/shall do the work.

তারা কাজটি করিবে- They will/shall do the work.

তারা বাজারে যাইবে(যাবে) - They will go to the market.

সাধারণত 1st person-এর পর shall বসে। এছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে will বসালেও চলবে।

Future Continuous Tense:

ভবিষ্যৎ কালে কোনও কাজ চলতে থাকবে এরকম বোঝালে Future continuous tense হয়।

বোঝার উপায় :

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে তে থাকিব, তে থাকিবে, তে থাকিবেন এদের যে কোনও একটি যুক্ত থাকে।

বাক্যের গঠন: Subject + shall be/will be + main verb + ing + object.

Subject-এর পর person ও number অনুসারে shall be বা will be বসে এবং মূল verb-এর শেষে ing যোগ হয়।

উদাহরণ :

আমি বইটি পড়িতে থাকিব - I shall be reading the book.

আমি গান গাইতে থাকিব- I shall be singing the song.

তারা ফুটবল খেলিতে থাকিবে- They will be playing football.

Future Perfect Tense :

ভবিষ্যৎ কালে কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোনও কাজ হয়ে যাবে বোঝালে বা দুটি কাজের মধ্যে একটি আগে হবে বোঝালে Future perfect tense হয়।

ভবিষ্য কালের দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে হবে তা Future perfect tense হয় এবং পরেরটা simple present tense হয়।

বোঝার উপায় :

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে ইয়া থাকিব, ইয়া থাকিবে, ইয়া থাকিবেন, এদের যেকোনও একটি যোগ থাকলে Future perfect tense হয়।

বাক্যের গঠন: 1st subject + shall have/will have + verb এর past participle + 1st object + before + 2nd subject + main verb + 2nd object.

Subject-এর পর person ও number অনুসারে shall have বা will have বসে এবং মূল verb-এর past participle form ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ

বাবা আসার আগে আমি কাজটি করিয়া থাকিব - I shall have done the work before my father comes.

আমি বিকাল চারটার মধ্যে বইটি পড়িয়া থাকিব - I shall have finished reading the book by 4. P. m.

Future Perfect Continuous Tense:

ভবিষ্যৎ কালে কোনও সময়ের মধ্যে কোনও কাজ চলতে থাকবে এরকম বোঝালে future perfect Continuous tense হয়।

ভবিষ্যৎ কালে দুটি কাজের মধ্যে যে কাজটি আগে চলতে থাকবে তা future perfect tense হয় যে কাজটি পরে হবে তা simple present tense হয়।

বোঝার উপায় :

বাংলায় ক্রিয়ার শেষে তে থাকিব, তে থাকিবে, তে তে থাকিবেন এদের যে কোনও একটি উল্লেখ থাকে।

বাক্যের গঠন : Subject - 1st subject + shall have been/will have been + main verb + ing + 1st object + 2nd subject + main verb + 2nd object.

Subject-এর পর shall have been বা will have been বসে এবং মূল verb-এর শেষে ing যোগ হয়।

উদাহরণ :

তুমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকব- we shall have been waiting for you until you come back.

বাবা আসার আগে পর্যন্ত আমি কাজটি করিতে থাকিব- I shall have been doing the work before my father comes.

## শিক্ষাগুরুর পরামর্শ

*প্রথম পাতার পর*

খেলাচ্ছলে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা করানো উচিত। এতে পড়ার প্রতি আগ্রহ আরও বাড়ে। তখন সব বিষয়কে সহজে আত্মস্থ করতে পারা যায়। আরেকটা বিষয় অবশ্যই দরকার ছাত্রজীবনে রুটিন মেনে চলা এবং সময়ের মূল্য বুঝে চলা। পড়াশোনাকে ভয় না করে ভালোবেসে করে যাও এবং যে বিষয়টা বুঝতে কষ্ট হবে অবশ্যই শিক্ষকের সহযোগীতা নেবে। সাফল্য নিশ্চিত। মনে রাখবে শিক্ষক-শিক্ষিকারা তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী, তোমাদের অভিভাবক, তোমাদের বন্ধু। শিক্ষিকা হিসাবে এই পরামর্শ তোমাদের জন্য রইল।

যুগশঙ্খ SUPPLI team
উত্তরণ
**শর্মিলা চন্দ্র** (কো-অর্ডিনেটর ও সাব-এডিটর), **তন্ময় মণ্ডল** (সাব-এডিটর), **বিদিশা রায়চৌধুরী** (কো-অর্ডিনেটর, অসম), **সালমা আহমেদ**

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭

## সময়ের গুরুত্বই সাফল্যের চাবিকাঠি

*প্রথম পাতার পর*

Question (প্রশ্ন কর), Read (পড়), Recite (আবৃত্তি কর), Review (পুনরায় স্মরণ কর)। অধ্যয়নকালে এই কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করলে অবিশ্বাস্য ফলাফল পাওয়া যায়। তবে যেটাই করা হোক তার ভেতর ধারাবাহিকতা থাকতে হবে, না হলে ফল ভালো হবে না।

আর তার চেয়ে বড় কথা হল এই অভ্যাস (সময়ের ঠিকঠাক ব্যবহার করার) যদি ছাত্রজীবনে তৈরি না হয় তাহলে পরবর্তীকালে প্রতি পদে হোঁচট খেতে হবে। ছাত্রটি যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবে তখন সময়ের এই বিভাজন এবং সময়ানুবর্তিতা তাকে অন্য মাত্রায় পৌঁছে দেবে। প্রতিদিন একটু একটু করে বাড়তে থাকা প্রেশারে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যাতে না যায় তার জন্যই, নির্দিষ্ট রুটিন মাফিক সময়ের কাজ সময়ে করতে হবে। তাই প্রত্যেককেরই একটা কথা মনে রাখা খুব প্রয়োজন, Time waits for none.

### ক্লাস সেভেন-এর টিউশন: ভূগোল

# নদী ও আমরা

নদী নিয়ে আমাদের আগেরবারের আলোচনায় আমরা নদী কীভাবে তৈরি হয় বা তার রকমভেদ ও নানারকমের কাজ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। কিন্তু নদী নিয়ে শুধু এইটুকু আলোচনা করলে আমাদের কথা শেষ হবে না। প্রাকৃতিক সব উপাদানের উপরে মানুষের জীবন নির্ভর করে। তাদের ছাড়া আমাদের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু অক্সিজেন বা বাতাসের মতোই নদীর গুরুত্ব একটু আলাদা বা বলা যায় বেশি। তোমরা তো ইতিহাসও পড়েছ। খেয়াল করেছ সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ কোনও না কোনও নদীর তীরেই নিজেদের বসতি গড়েছে। তাকে নির্ভর করে কৃষি, ব্যবসার প্রসার করেছে।

নদী প্রবহমান জলের ধারা। নদী জলপথে পরিবহণ সহজ করে। নদীপথ ধরে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যোগাযোগ করা যায়। নদী বিভাজিকার কাজ করে দুই অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব বজায় রাখে। এর ফলে প্রাচীন আমল থেকে নদী সুরক্ষার সহায়ক। আর নদীর সঞ্চয়কাজের ফলে জমা পলি জমির উর্বরতা বাড়ায়। ফলে নদীর তীরেই প্রাচীন সভ্যতাগুলো শুরু হয়েছিল, যেমন, সিন্ধু নদীর তীরে সিন্ধু সভ্যতা, নীল নদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিস নদীর তীরে সুমেরীয় সভ্যতা। পৃথিবীর বিখ্যাত উন্নত বা উন্নতিশীল সভ্যতা নদীকেই কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। যেমন— গঙ্গা-পদ্মা-ব্রহ্মপুত্রের মাঝে বিশাল সমভূমি, চিনের ইয়াং সিকিয়াং নদীর তীর, হোয়াংহো নদীর উপত্যকা ইত্যাদি। নদীর প্রভাবের কথা আলোচনা করতে গেলে কিছু বিষয় মনে রাখতে হবে, যেমন— নদীর জল, সমভূমি, প্লাবনভূমি, কৃষিজমি, জলসেচ, জলবিদ্যুৎ, নদীর মাছ-প্রাণী থেকে তৈরি খাদ্য, পরিবহণ ইত্যাদি।

নদী তার যেসব কাজের মধ্যে দিয়ে প্রতিনিয়ত আমাদের জীবন, সভ্যতাকে প্রভাবিত করে চলেছে তার একটা অন্যতম কারণ নদীপ্রবাহ। নদীপ্রবাহকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়-১. উচ্চপ্রবাহ, ২. মধ্যপ্রবাহ ও ৩. নিম্নপ্রবাহ।

উচ্চপ্রবাহ: নদীর উৎস থেকে সমভূমিতে পৌঁছনো পর্যন্ত ধারাকে উচ্চপ্রবাহ বা উচ্চগতি বলে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামার সময় নদী খরস্রোতা হয় ও নদীর শক্তি সবথেকে বেশি হয়। এখানে মূলত নদী ক্ষয়কাজ করে। প্রবল স্রোতের ফলে বড় পাথর ভেঙে টুকরো হয়ে প্রবাহিত হয়। নদীর ক্ষয়কাজে নদীর গভীরতা বাড়তে থাকে। উচ্চপ্রবাহে উপনদীর সংখ্যা খুব কম থাকে তাই নদীপথ খুব সরু হয়। এর ফলে নদী উপত্যকা গভীর হয়ে V আকৃতি ধারণ করে। একে গিরিখাত বলে। শুষ্ক, বৃষ্টিহীন পার্বত্য অঞ্চলে এই গিরিখাতকেই 'ক্যানিয়ন' বলে। উচ্চপ্রবাহে নদীর গতিপথে শক্ত আর নরম পাথর অনুভূমিক ভাবে থাকলে নদী নরম শিলাকে বেশি ক্ষয় করে ধাপের সৃষ্টি করে। ফলে নদী উঁচু ধাপ থেকে নীচে ঝাঁপিয়ে পড়ে। একে জলপ্রপাত বলে।

মধ্যপ্রবাহ: পার্বত্য অঞ্চলের পর নদী সমভূমি বা মালভূমিতে যখন বয়ে চলে তখন তাকে মধ্যপ্রবাহ বলে। এখানে ঢাল কমে যাওয়ার ফলে নদীর শক্তি কমে যায়। ফলে উচ্চপ্রবাহে নদী যা ক্ষয় করে তার জলের সঙ্গে বয়ে আনে তা এখানে থিতিয়ে পড়ে। ফলে নদীর দু'পাশে নদীর সঞ্চয় কাজ দেখা যায়। এখানে নদীতে অনেক উপনদী এসে মেশে ফলে নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে যায় ও নদী চওড়া হয়। নদীর ক্ষয়কাজ শুধু নদীর দুপাশে হয়। এখানে ঢাল কমে গেলেও নদীতে জলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় নদী আঁকাবাঁকা পথে চলে। একে মিয়েন্ডার বলে। নদীতে চড়া পড়ে, যাকে দ্বীপ বলে। কোথাও কোথাও নদীর এক পার অন্য পারের থেকে নরম হলে নদী নরম পারে ক্ষয় বেশি করে আর উলটোদিকে সঞ্চয়। এইভাবে একসময় নদীর বাঁকের একটা অংশ মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে হ্রদের মতো দেখতে জলাধার তৈরি হয়। এই অংশগুলি অশ্বক্ষুরের মতো দেখতে হয়। এদের অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলে।

নিম্নপ্রবাহ: মধ্যপ্রবাহের পর সমুদ্রে মিলিত হওয়ার আগে মোহনা পর্যন্ত অংশকে নদীর নিম্নপ্রবাহ বলে। এই সময় নদীর মূল কাজ সঞ্চয়। এইসময় উপনদী প্রায় থাকেই না। বরং অনেক শাখানদী সৃষ্টি হয়। নদীখাত খুব অগভীর হয়ে যায়। ফলে বৃষ্টিতে নদী উপচে যায় ও বন্যা হয়। এর ফলে নদীর দু-কূলে পলি জমা হয়ে প্লাবনভূমি তৈরি হয়। মোহনার কাছে নদীর মুখে বয়ে আনা বালি, কাঁকর, পলি জমা হয়ে চড়া তৈরি হয়। নদী দুই ভাগে ভাগ হয়ে গ্রিক অক্ষর ডেল্টার মতো দেখতে ব-দ্বীপ তৈরি করে। তবে পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজনের কোনও ব-দ্বীপ নেই। এখানে ফানেলের মতো চওড়া মোহনাকে খাঁড়ি বলে।

মনে রেখ, সব নদীর কিন্তু এই তিনটি প্রবাহ থাকে না। কিছু ব্যতিক্রম আছে।

### ক্লাস এইট-এর টিউশন: বিজ্ঞান

# ঘনীভবন ও তাপের প্রবাহ

বিগত কিছু সংখ্যায় আমরা তাপ নিয়ে আলোচনা করেছি। আজ আমরা ঘনীভবন আর তাপের প্রবাহ নিয়ে আলোচনা করব। তাপের বৃদ্ধি বা হ্রাসে পদার্থের অবস্থার নানা রকম পরিবর্তন হয়। কখনও পদার্থ তরল হয়, কখনও গ্যাসে পরিণত হয় আবার কখনও কঠিন হয়। এর আগে আমরা বাষ্পীভবন বা তরল পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থায় পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে জেনেছি। এবার প্রথমে আমরা ঘনীভবন নিয়ে জানব।

ঘনীভবন: বাষ্পের তাপ বিলীন হয়ে তরল হওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘনীভবন বলে। বায়ুমণ্ডলে ঘনীভবন হয় বলেই মেঘ, শিশির ও কুয়াশা তৈরি হয়।

মেঘ: পৃথিবীর জলমণ্ডল (পুকুর, নদী, সাগর, ইত্যাদি), ভিজে মাটি এমনকী জীবদেহ থেকেও তাপের প্রবাহে বাষ্পীভবন হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছে উষ্ণ বায়ুতে এই জলীয় বাষ্প মেশে। এই আর্দ্র ও উষ্ণতর বাতাস অপেক্ষাকৃত হালকা হওয়ায় উপরে উঠে যায়। উচ্চতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পের উষ্ণতা কমতে থাকে। এর সঙ্গে বায়ুচাপ কমতে থাকলে বায়ুর কণাগুলির মধ্যে দূরত্ব বাড়ে। এই সময় এরা বাতাসে উপস্থিত ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে জলকণায় পরিণত হয়। এই অবস্থায় একাধিক জলকণা একত্রিত হয়ে মেঘ সৃষ্টি করে।

কুয়াশা: শীতকালে ভোরবেলায় কুয়াশা দেখা যায়। শীতকালে রাতে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে বাতাস ক্রমশ শীতল হতে থাকে। ফলে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি অনেকটা জায়গার বাতাস ঠান্ডা হয়ে সেখানকার বাতাস উপস্থিত জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। এরপর শীতল হয়ে ঘনীভূত হলে মাটির কাছে জলকণা রূপে ভেসে বেড়ায়। একেই আমরা কুয়াশা বলি।

শিশির: শিশিরও শীতকালেই দেখা যায়। ভোরবেলায় বা গভীর রাতে ঘাসের আগায় বা গাছের পাতায় জমে থাকা জলকণাকেই শিশির বলে। এই প্রাকৃতিক ঘটনা তাপের ঘনীভবনের ফলেই ঘটে। কুয়াশার মতো একই পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বাষ্প জলকণায় পরিণত হয়ে ভারী হয়। তখন তারা আর বাতাসে ভেসে থাকতে না পেরে মাটির সংলগ্ন কোনও অবলম্বনে থিতিয়ে পড়ে। যেহেতু এই প্রক্রিয়ায় সময় বেশি লাগে তাই সন্ধেবেলায় শিশির দেখা যায় না।

তাপের প্রবাহ: তোমরা আগেই জেনেছ যে তাপ একটি শক্তি যার উপর বস্তুর উষ্ণতা নির্ভর করে। তাপ যে কোনও পদার্থের উষ্ণতর অংশ থেকে শীতলতর অংশে প্রবাহিত হয়। একে তাপের প্রবাহ বলে। এই প্রবাহ তিন রকম প্রক্রিয়ায় হয়, যেমন— পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ।

পরিবহন: কোনও কঠিন পদার্থের মধ্যে দিয়ে তাপ প্রবাহিত হওয়ার পদ্ধতির নাম পরিবহণ। এই পদ্ধতিতে পদার্থটির নিজের বা কোনও অংশের সরণ হয় না, শুধু তাপ এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রবাহিত হয়। যেমন, স্টিলের চামচের মাথা যদি আগুনে গরম কর আস্তে আস্তে পুরো চামচটাই উত্তপ্ত হবে। কিন্তু সব পদার্থ তাপ পরিবহণ করতে পারে না। যারা তাপ পরিবহণ করে তাদের তাপের সুপরিবাহী পদার্থ বলে, যেমন, লোহা, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি। আর যারা তাপ পরিবহণ করতে পারে না তাদের তাপের কুপরিবাহী বলে, যেমন, বাতাস, জল, মাটি, খড়,কাঠ ইত্যাদি। এর একটা উদাহরণ হিসাবে তোমরা হাতিকে শীতকালে গায়ে ধুলো মাখতে দেখে থাকবে। এর ফলে ওদের শরীর আর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ধুলো দিয়ে বেষ্টিত একটা আলাদা স্তর তৈরি হয়। এই স্তর তাপের কুপরিবাহী হওয়ায় শরীরের তাপ বিলীন হতে পারে না। শরীর গরম থাকে।

পরিচলন: তরল বা গ্যাসে এই পদ্ধতিতে তাপ প্রবাহিত হয়। তরল বা গ্যাসের উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে তা শীতল অংশের থেকে বেশি হালকা হয় ফলে তা উপরে উঠে যায়। সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করতে শীতল গ্যাস বা তরল নীচে নেমে আসে। এই ভাবে চক্রাকারে তরল বা গ্যাস আবর্তিত হতে থাকে যতক্ষণ না এর সব অংশ সমান উষ্ণতায় আসছে। এই চক্রাকার স্রোতকে পরিচলন স্রোত বলে। যেমন, বায়ুচলন বা ভেন্টিলেশন পরিচলন পদ্ধতি। আমাদের শরীর থেকে যে বায়ু নিঃশ্বাসের সঙ্গে বার হয় তা উষ্ণ হয়। ফলে এই বাতাস উপরের দিকে উঠতে থাকে। তাই বদ্ধ ঘরে ঘুলঘুলি থাকলে সেখান দিয়ে এই দূষিত বাতাস বেরিয়ে যায়। এই শূন্যস্থান পূরণ করতে অক্সিজেন সমৃদ্ধ শীতল বাতাস ঘরে ঢোকে। পরিচলন পদ্ধতিতে ঘরে বাতাসের প্রবাহ বজায় থাকে।

বিকিরণ: খেয়াল করে দেখ, আগের দুই পদ্ধতিতেই তাপ পরিবাহিত হওয়ার জন্য একটি মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। কোনও মাধ্যম ছাড়া তাপ পরিবহণের পদ্ধতির নাম বিকিরণ। যেমন শীতকালে আগুন জ্বালিয়ে হাত গরম করার সময় তাপ বিকিরণ পদ্ধতিতে পরিবাহিত হয়। কারণ বাতাস তাপের কুপরিবাহী। সূর্য থেকেও তাপ এই পদ্ধতিতে পৃথিবীতে পৌঁছয়।

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭

## ক্লাস নাইন-এর টিউশন: ইতিহাস

# ফরাসি বিপ্লব

ফরাসি বিপ্লবের আগের সময়ে ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো ফ্রান্সের সমাজও ছিল মধ্যযুগীয় ও সামন্ততান্ত্রিক। ফরাসি সাম্রাজ্যের বৈশিষ্ট্য ছিল অসাম্য। এইসময় ফ্রান্সের বেশিরভাগ মানুষকে 'বানাতিল' নামক বাধ্যতামূলক কর দিতে হত সামন্তপ্রভুদের কারখানায় বিভিন্ন কাজ করার বিনিময়ে। এই কাজের মধ্যে ছিল গম ও যব ভাঙানো, সুরা প্রস্তুত করা, সামন্তপ্রভুর রুটির কারখানায় রুটি তৈরি করা, ঘানি থেকে তেল তৈরি করা প্রভৃতি। এই যুগে সমাজে সুবিধাভোগী ও সুবিধাহীন দু'টি শ্রেণির মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। সুবিধাভোগী শ্রেণির মধ্যে ছিলেন যাজক ও অভিজাত সম্প্রদায়, আর সুবিধাহীন শ্রেণি ছিল কৃষক, মধ্যবিত্ত, সাঁকুলেত প্রমুখ। এরা ছিল শোষিত শ্রেণি।

শ্রেণিসংগ্রামই হল বিপ্লবের বাহন। শোষিত শ্রেণি সুবিধাভোগী শ্রেণির রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক সমস্ত ক্ষমতা বিপ্লবের মাধ্যমে ধ্বংস করে। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে যে বিপ্লব দেখা দিয়েছিল তা হঠাৎ হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে ফরাসি রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতিতে যে ব্যবস্থা চলে আসছিল তার সঙ্গে ফ্রান্সের বৃহত্তর জনসমষ্টির স্বার্থ জড়িত ছিল না তাই শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

সপ্তদশ শতকে চতুর্দশ লুই-এর আমলে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের শাসন কায়েম হলে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের রাজারা ঈশ্বরদত্ত রাজক্ষমতা অনুসারে রাজ্যশাসন করতেন। এই নীতির উপর নির্ভর করে চতুর্দশ লুই ফরাসি রাজতন্ত্রকে ক্ষমতার আধারে পরিণত করেন। রাজার ক্ষমতা বোঝাবার জন্য তিনি বলেন, 'রাজাই হল রাষ্ট্র'। রাজার ক্ষমতাকে সর্বময় করার জন্য ফ্রান্সের স্টেট জেনারেলের অধিবেশন ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে বন্ধ থাকে। প্রতিনিধি সভা না থাকায় ফ্রান্সের বুরবোঁ রাজারা নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে শাসনকার্য চালাতে থাকে। এইভাবে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণাকে অস্বীকার করা হয়।

রাজা চতুর্দশ লুই-এর পর থেকে বুরবোঁ বংশে সুযোগ্য শাসকের অভাব দেখা দেয়। রাজা পঞ্চদশ লুই ছিলেন অলস প্রকৃতির। তাঁর বিলাসবহুল জীবনযাপন ও উচ্ছৃঙ্খলতা তথা ভ্রান্ত বৈদেশিক নীতি ফ্রান্সে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে। 'অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধ' ও সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ইংল্যান্ডের কাছে পরাজয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। সেই সঙ্গে রাজকোষও প্রায় শূন্য হয়ে পড়ে।

পঞ্চদশ লুই-এর পরবর্তী রাজা ষোড়শ লুই ছিলেন অপদার্থ। তিনি তাঁর রানি মেরি আঁতোয়ানেত-এর বশবর্তী ছিলেন। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অভিজাত শ্রেণিরা সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হস্তগত করে। এছাড়াও ষোড়শ লুই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে রাজকোষ শূন্য করে ফেলেন। রাজার নিয়ন্ত্রণ শিথিল হওয়ায় প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। সরকারি কর্মচারী ও সরকারি বিভাগগুলির ক্ষমতা ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট না থাকায় সরকারি কাজকর্মে প্রবল বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। প্রাদেশিক শাসকরা কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশ অবাধে অমান্য করতে থাকে। এর ফলে শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বৈরাচারী ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য চরম অত্যাচারী হয়ে ওঠে। জনসাধারণ তাদের 'অর্থলোলুপ নেকড়ে' উপাধিতে ভূষিত করে।

ফরাসি জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা বলে কিছুই ছিল না। রাজার সভাসদেরা রাজার স্বাক্ষরযুক্ত 'লেটারস-দ্য-কেসে' নামে এক পরোয়ানা দ্বারা যে কোনও ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বাস্তিল দুর্গে বন্দি করতে পারত। রাজকীয় ক্ষমতার উপর ফ্রান্সের প্রদেশগুলিতে অবস্থিত প্রাদেশিক সভা বা পার্লামেন্টগুলির প্রভাব ছিল সীমাহীন। প্রাদেশিক সভার সম্মতি ছাড়া রাজার কোনও নির্দেশ প্রদেশগুলিতে কার্যকরী করা যেত না। প্রাদেশিক সভাগুলিতে স্থানীয় অভিজাতরাই প্রাধান্য ভোগ করত। রাজা কোনও আইন জারি করলে তাকে অবশ্যই প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে অনুমোদন পেতে হতো।

## ক্লাস টেন-এর টিউশন: ভূগোল

# ভূমিরূপ

**বায়ুর কাজের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ:**

বায়ু একটি অদৃশ্য প্রাকৃতিক শক্তি। এই শক্তিও ক্ষয়, অপসারণ ও সঞ্চয় বা অবক্ষেপের মধ্যে দিয়ে নানারকম ভূমিরূপ তৈরি করে। বায়ুর নানারকম কাজ সবথেকে বেশি দেখা যায় মরুভূমি ও সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে। মরুভূমিতে গাছপালা কম আর মাটি বালু প্রকৃতির হওয়ায় মাটি আলগা হয়। সমুদ্রের উপকূলেও মাটি লবণযুক্ত হওয়ায় ও ভেজা থাকায় আলগা প্রকৃতির হয়। আবার একইসঙ্গে এখানে গাছপালা, বাড়ি-ঘরের বাধা না থাকায় বায়ু চলাচল নির্বিঘ্নে হয়। বাতাসের শক্তি অনেক বেশি থাকে। তাই বাতাস সহজেই মাটির ক্ষয়, অপসারণ ও সঞ্চয় করতে পারে। মরুভূমিতে দিন ও রাতের উষ্ণতার তারতম্য বেশি থাকায় যান্ত্রিক আবহবিকারের ফলে ক্ষয়কাজ বেশি হয়। তাই এই দুই অঞ্চলে বায়ু দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ সবথেকে বেশি দেখা যায়। আজ আমরা মরুভূমিতে সৃষ্ট ভূমিরূপগুলো নিয়ে জানব।

বায়ুর অবঘর্ষণ ও ঘর্ষণের(ক্ষয়কার্য) ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ:

১) **গৌর:** বাতাসের অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাঙের ছাতার মতো দেখতে ভূমিরূপকে গৌর বলে। কোনও শিলাস্তূপের নীচে কোমল শিলা ও উপরে কঠিন শিলা থাকলে নীচের অংশ বেশি ক্ষয়ে এই ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। এই ভূমিরূপকে সাহারা মরুভূমিতে গৌর ও জার্মানিতে পিট ফেলসেরন বলে।

২) **জুগ্যান:** যখন কোনও শিলাস্তূপে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর সমান্তরাল ভাবে থাকে তখন অবঘর্ষ প্রক্রিয়ার ফলে এই ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। কঠিন শিলা উপরে চওড়া ও চ্যাপটা হয়ে থাকে। আর কোমল শিলাস্তর ক্রমশ সরু হয়ে যায়। সাহারা মরুভূমিতে এইরকম ভূমিরূপ দেখা যায়। এরা প্রায় ১-৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

৩) **ইয়ার্দাং:** বায়ুর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলা পাশাপাশি উল্লম্ব ভাবে থাকলে বায়ুর ক্ষয়কাজের ফলে এই ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে এদের দেখা যায়। এরা প্রায় ১০০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। এদের দেখতে মোরগের ঝুঁটির মতো হয়। এদের নীচের অংশ মোটা, সুচলো ও অমসৃণ হয়।

৪) **ইনসেলবার্জ:** অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমিতে এই ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। মরুভূমিতে জায়গায় জায়গায় কঠিন শিলায় তৈরি ছোট পাহাড়গুলো যুগ যুগ ধরে বাতাসের অবঘর্ষ ও অপসারণ প্রক্রিয়ায় টিলার আকার ধারণ করে। এদের ঢাল খুব বেশি, উচ্চতা কম আর গা মসৃণ হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মরুভূমিতে এদের দেখা যায়। এরা মরুভূমি জুড়ে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকে।

**অপসারণের ফলে গঠিত ভূমিরূপ:**

১) **ধান্দ:** রাজস্থানের থর মরুভূমিতে জোরে বায়ুপ্রবাহের ফলে আলগা ও শুকনো বালি অপসারিত হয়ে কোনও কোনও স্থান ছোট-বড় গর্ত তৈরি করে। এদেরকেই স্থানীয় লোকেরা ধান্দ বলে।

২) **মরূদ্যান:** মরুভূমিতে একটা বড় জায়গা জুড়ে বালি সমানে অপসারিত হতে হতে ভূগর্ভের জলস্তরের কাছাকাছি চলে এলে নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়। একে মরূদ্যান বলে। সাহারা মরুভূমিতে লিবিয়ায় অজিলা ও কুফ্রা মরূদ্যান নামকরা।

**বায়ুর সঞ্চয় কাজের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ:**

১) **বালিয়াড়ি:** মরুভূমিতে কোনও উচ্চভূমি বা বড় প্রস্তরখণ্ড বা ঝোপঝাড় থাকলে বাতাসে ভাসমান বালিকণা বাধা পেয়ে সেখানেই জমা হতে থাকে। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এই জমা হওয়া বালির স্তূপকে বালিয়াড়ি বলে। বিজ্ঞানী ব্যাগনল্ডের মতে, এরা দুই প্রকারের হয় তির্যক ও অনুদৈর্ঘ্য বালিয়ারি।

**তির্যক বালিয়ারি বা বার্খান:** বায়ুর গতিপথের সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবে তির্যক বালিয়াড়ির সৃষ্টি হয়। বার্খান বাতাস যেদিকে বয় সেদিকে ক্রমশ ঢালু আর উলটো দিকে খাড়া হয়। অর্থাৎ সামনের দিক উত্তল ও পিছনের দিক অবতল হয়। এদের উচ্চতা ১৫ থেকে ৩০ মিটার পর্যন্ত হয়। থর মরুভূমিতে বার্খান দেখা যায়।

**সিফ বালিয়াড়ি:** এরা বায়ুর গতিপথের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে অবস্থান করে এদের মাথার দিক তীক্ষ্ণ করাতের মতো হয়। এদের প্রস্থ উচ্চতার থেকে প্রায় ৬ গুণ বেশি। এরা সাধারণত কয়েকশো কিলোমিটার দীর্ঘ হয়। দুটো বালিয়াড়ির মাঝের অংশ করিডরের মতো হয় যা চলাচলের পথ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এদেরকে হামাদা বা রেগ বলে। ইরানের উপকূলে এদের দেখা যায়।

২) **লোয়েস সমভূমি:** মরুভূমির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বালুকণা, ধূলিকণা বাতাসের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে যখন কোনও নিম্নভূমিতে সঞ্চিত হয়ে যে নতুন সমভূমির সৃষ্টি করে তাকে লোয়েস সমভূমি বলে। গোবি মরুভূমি থেকে বালুকণা বাহিত হয়ে চিনের হোয়াং-হো নদীর উপত্যকায় লোয়েস সমভূমির সৃষ্টি করেছে।

তোমাদের প্রিয় 'উত্তরণ'-এ **'আমার স্কুল'** বিভাগের জন্য তোমরা তোমাদের স্কুল সম্পর্কে লিখে জানাও, লিখে জানাও স্কুলের টিচাররা পড়াশোনায় তোমাদের কীভাবে সাহায্য করেন। সঙ্গে পাঠিও তোমার ও তোমার স্কুলের ছবি। খাতায় লিখে বাড়ির বড়দের বলবে ইউনিকোড হরফে (যেমন অভ্র) টাইপ করে মাইক্রোসফট ওয়ার্ড ফাইল (.doc) মেল করে দিতে বলো। মেল করার সময় মেল-সাবজেক্ট লিখে দিতে বোলো 'CONTENT FOR AAMAR SCHOOL'

মেল আইডি:
**jugasankha.suppli@gmail.com**

যুগশঙ্খ
SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭

জেনারেল নলেজ

# নাইট্রোজেন চক্রের কথকতা

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ওপর যখন মানুষের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়, বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিন্তু 'কার্বন চক্র'ই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দৃষ্টি কেড়ে নেয়। করবে নাই-বা কেন? অন্যান্য দিকগুলো বাদই দিলেও, এই যে তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা, এর জন্য তো কার্বন-চক্রের সাম্যবস্থার বিপর্যয়ই দায়ী। কলকারখানা, গাড়ি, নিউক্লিয় চুল্লি থেকে রান্না ঘরের চুলা- কার্বন-চক্রের বারোটা বাজাতে কারোরই অবদান কম নয়। কিন্তু এই বিপর্যয়ে সব দৃষ্টি যদি কার্বন-চক্র একা কেড়ে নিয়ে থাকে তবে ওদিকে নীরবে-নিভৃতে কিন্তু ধস নামিয়ে দিচ্ছে 'নাইট্রোজেন চক্র'। এই ব্যাপারে আমরা তেমন চিন্তিত না হলেও, আমাদেরই নানান কর্মকান্ডের কারণে নাইট্রোজেন চক্রে সৃষ্ট সাম্যবস্থার বিপর্যয় আমাদেরই ভবিষ্যতকে হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে।

পৃথিবী থেকে শুরু করে বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত একটা নিয়ত চক্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন বিভিন্ন রাসায়নিক রূপে পরিবর্তিত হয় এবং পুনরায় আগের রূপে ফিরে আসে, এটাই মূলত নাইট্রোজেন চক্র নামে পরিচিত। বিভিন্ন জৈবরাসায়নিক এবং প্রাকৃতিক পক্রিয়ার মাধ্যমে এই চক্রটি পরিচালিত হয়। যার মধ্যে ঘনীভবন বা মজুদ, অ্যামোনিফিকেশন, নাইট্রিফিকেশন এবং ডিনাইট্রিফিকেশন অন্তর্ভুক্ত। মানবজীবনের জন্য মহাগুরুত্বপূর্ণ এই নাইট্রোজেন চক্র। কারণ, প্রাথমিক উৎপাদন এবং পচন এই চক্রের উপর নির্ভরশীল। প্রাথমিক উৎপাদন যার ওপর পুরো বিশ্ব নির্ভরশীল, তার ওপর নাইট্রোজেন চক্রের প্রভাব থেকেই আমাদের জীবনে এর গুরুত্ব বোঝা যায়। কিন্তু গত কয়েক দশকের প্রেক্ষাপটে শিম কিংবা কলাই জাতীয় শস্যের অধিক উৎপাদন, শস্যক্ষেত্রে নাইট্রেট সার ব্যবহার, হেবার-বস প্রক্রিয়ার ব্যাপক প্রচলন, যানবাহনের ধোঁয়া, শিল্পকারখানা, প্রচুর পরিমান রাসায়নিক সারের ব্যবহার ইত্যাদি থেকে অক্সাইডরূপে নির্গত নাইট্রোজেন প্রতিনিয়ত নাইট্রোজেন চক্রের অস্থিতিশীলতা বাড়িয়ে চলেছে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, শুধুমাত্র যদি কৃষিক্ষেত্র বাদ দিই, তবে নাইট্রেট নির্গমনে অন্যান্য ক্ষেত্রের ভূমিকা মাত্র ২০ শতাংশ বা তারও কম। এদের মধ্যে ৬ শতাংশ সরাসরি যোগ হয় জলের বিভিন্ন উৎসে এবং বাকি ১৪ শতাংশ মজুদ হয় বায়ুমণ্ডলে। অর্থাৎ, নাইট্রেট নির্গমনের দ্বারা চক্রে বড়সড় একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করেছে কৃষিক্ষেত্র। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রাস অক্সাইডের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করতে ভূমিকা রাখছে রাসায়নিক সার, জৈববস্তুপুঞ্জের দহন এবং গৃহপালিত পশুর পুষ্টি সংক্রান্ত প্রক্রিয়া।

১০০৫ সালে আমেরিকার কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন প্রক্রিয়ার জন্য উৎপাদকেরা পরিবেশে ৩৬ বিলিয়ন পাউন্ড নাইট্রোজেন যোগ করেছিলেন! এর ভিতর ২৩ বিলিয়ন পাউন্ড ছিল নাইট্রোজেন সার থেকে উৎপন্ন এবং বাকি ১৩ বিলিয়ন পাউন্ডের উৎস ছিল জৈব সার। ধারণা করা হয়েছিল যে, এর মধ্যে বিলিয়ন পাউন্ড শস্যে উৎপাদনে কোন কাজেই আসেনি। এর ফলস্বরূপ, এগুলো নদী, পুকুর, ভুগর্ভস্থ জলে মিশে এগুলোকে দূষিত করেছিল। সেবার শুধু গম এবং ভুট্টা উৎপাদনের জন্যই ব্যবহার করা হয়েছিল ২৩ বিলিয়ন পাউন্ড নাইট্রোজেন সার, যা ৫০ বছর আগের পায় ২৫ গুণ। এই নিরীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, কৃষিভূমিতে প্রতি বর্গমাইলে নাইট্রেট দূষণের পরিমাণ ছিল ০.৯৩ টন যেখানে তা শহর এলাকায় ছিল ০.৫৪৭ টন। বনাঞ্চল এবং কৃষিভূমিতে এই পরিমাণ ছিল আরও কম, যা প্রপতি বর্গমাইলে যথাক্রমে ০.২৬ এবং ০.০৩ টন।

সমীক্ষা থেকে আরও প্রমাণিত হয় যে, কৃষিভূমি শহরাঞ্চলের চেয়ে প্রায় ২০ গুণ বেশি নাইট্রেট নির্গমন করে যা দূষণের জন্য দায়ী। এছাড়া, ভুট্টা এবং সয়াবিন উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কৃষিভূমি বৃক্ষাঞ্চলের চেয়ে পায় ১১ গুণ নাইট্রেট নির্গমন করে। সমীক্ষার উপর ভিত্তি করে কয়েক বছরের ভেতরেই আমেরিকা সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশে এ বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করা হয় যেখানে নাইট্রেট সার ব্যবহারের নিয়ম বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু এত কিছুর পরও ২০১০ সালে পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা গেছে, নাইট্রোজেনের ফলে সৃষ্ট দূষণের ৯৩.৭ শতাংশের জন্যই দায়ী কৃষিক্ষেত্র। বাধাধরা নিয়মের পরেও লাগাম কেন হাতছাড়া এটা ধরতেই গবেষণা করেন 'কলরাডো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়'-এর গবেষকরা। নাইট্রেট নিয়ে গবেষণা করলেও তাঁরা কিন্তু অ্যামোনিয়ার বিষয়টি আসলে আগে বিবেচনায় আনেননি। ঝামেলাটা ধরা পড়ল সেখানেই। কৃষিক্ষেত্র থেকে নির্গত অ্যামোনিয়ার পরিমাণ ছাড়িয়ে গেছে জীবাশ্ম জ্বালানিকেও। উৎস যাই হোক, বায়ুমণ্ডলে মজুদ হওয়া গ্যাস চক্রাকারে সিক্ত ও শুষ্ক প্রক্রিয়ায় স্থলজ এবং জলজ বাস্তসংস্থানে ফিরে আসছে যা প্রকৃতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়াকে শিথিল করতে রাখছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এর প্রভাবের মধ্যে রয়েছে মৃত্তিকার অম্লীকরণ, জীববৈচিত্র হ্রাস এবং হ্রদ ও স্রোত প্রবাহের প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন।

গবেষণা দলটির প্রধান ছিলেন 'কলোরাডো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়'-এর 'বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞান' বিভাগের প্রধান এবং অধ্যাপক জেফ্রি কোলেট। তাঁর সাহায্যকারী হিসাবে ছিলেন 'এনভায়রনমেন্টাল প্রোটেকশন এজেন্সি', 'ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিস' এবং 'ন্যাশনাল অ্যাটমোস্ফেরিক ডিপোজিশন প্রোগ্রাম'-এর কর্মীরা। ৯ মে 'প্রসিডিংস অব ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সেস' জার্নালে প্রকাশিত গবেষণাপত্রে গবেষকরা নাইট্রোজেনের মজুদে ধীর কিন্তু নির্ণেয় পরিবর্তনের কথা বলেন। বায়ুমণ্ডল থেকে জীবমণ্ডলে সক্রিয় নাইট্রোজেন চালিত হচ্ছে যা বাস্তসংস্থানকে দুর্বল করতে শুরু করেছে। গবেষণাপত্রটির প্রধান লেখক হলেন ওয়াই লি যিনি 'কলোরেড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়' থেকে সম্প্রতি পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেছেন।

বিংশ শতাব্দী থেকে শুরু করে মানবসৃষ্ট দুটো কারণে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের মজুদ বেড়েছে। প্রথমটি, বিভিন্ন উৎস থেকে নাইট্রোজেন অক্সাইডের নির্গমন যা বায়ুমণ্ডলে নাইট্রেট পরিণত হয়। এবং দ্বিতীয়ত, অ্যামোনিয়া যা প্রধানত জীবসৃষ্ট বর্জ্য এবং নাইট্রোজেন সার থেকে উৎপন্ন হয়ে অ্যামোনিয়ারূপে চক্রে প্রবাহিত হয়। বর্তমান সময়ে জীবাশ্ম জ্বালানীর প্রতি অধিক দৃষ্টিপাত করা হয়েছে এবং কারিগরি ও সরকারি নীতিমালা প্রণয়নের দ্বারা প্রধান পদক্ষেপগুলোও নেওয়া হয়েছে এই ধরনের উৎস থেকে নিঃসরণকে বাঁধা প্রদানের জন্য।

অপরদিকে, কৃষি সম্পর্কিত প্রক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া নিয়ে মাথাব্যথা তেমন একটা নেই বললেই চলে। ফলে, এটা কোন নিয়ন্ত্রিত দূষক নয়। 'কলোরেড স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়'-এর গবেষকরা লক্ষ করেছেন যে, অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন মজুদের প্রধান উৎস এবং নাইট্রোজেন চক্রে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য প্রধান উপাদান হিসাবে অনেক আগেই নাইট্রেটকে অতিক্রম করেছে।

কোলেটের মতে, 'আমরা নাইট্রোজেন মজুদের প্রধান উৎস হিসাবে নাইট্রেটকেই দায়ী করি। কিন্তু কথাটা আশির দশকের জন্য সত্যি ছিল। আমরা নাইট্রেটকে এতই বেশি নিয়ন্ত্রণ করেছি যে এখন নাইট্রোজেন মজুদের প্রধান উৎস হয়ে উঠেছে অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেটের পরিবর্তে অ্যামোনিয়া এখন নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস হয়ে পূর্বের সাম্যতা রক্ষা করে চলেছে।'

গবেষকদের মতে, যদিও বায়ুমণ্ডলে বর্তমান ঘনমাত্রায় অ্যামোনিয়া মানবজাতির জন্য বিষাক্ততার পর্যায়ে পৌঁছায়নি তবুও এর অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন দূষক বস্তুকণার মধ্যে অ্যামোনিয়াকে অগ্রদূত বলা চলে যার মধ্যে রয়েছে অ্যামোনিয়ার যৌগ অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট। গবেষণাপত্রে গবেষকরা নাইট্রোজেন মজুদের উৎসকে নাইট্রেট থেকে অ্যামোনিয়ায় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সিক্ত মজুদকে সাপেক্ষ হিসাবে বিবেচনা করেছেন যার দ্বারা নাইট্রোজেন চক্রে প্রবেশের মাধ্যমে বৃষ্টি অথবা তুষার তৈরি করে। এছাড়া, নাইট্রোজেনের ক্ষেত্রে শুষ্ক মজুদও ঘটতে পারে যার মাধ্যমে গ্যাস অণু অথবা কণা বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি ভূপৃষ্ঠে জমা হয়। শুষ্ক মজুদের ক্ষেত্রে পরিমাণ নির্ণয় করা আরও কঠিন। কোলেটের মতে, 'এই প্রভাবগুলো বিশ্লেষণ করার জন্য আমাদের হাতে অনেক কম তথ্য বিদ্যমান।' এই গবেষণা থেকে বাস্তসংস্থানে অতিরিক্ত নাইট্রোজেনের অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে অ্যামোনিয়ার প্রভাব কতটা তা বোঝা যায়।

কোলেন আরও বলেন, 'নীতি নির্ধারকদের অ্যামোনিয়ার ব্যাপারটা নিয়েও সমানভাবে ভাবতে হবে, শুধুমাত্র নাইট্রেট নিয়ে ভাবলে চলবে না। আমরা নাইট্রেটের পরিমাণ কমানোর জন্য নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসগুলোর নিঃসরণ নিয়ে কঠোর পরিশ্রম করেছি, কিন্তু আমরা যদি অতিরিক্ত নাইট্রোজেন মজুদ গাসের ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করতে চাই, তবে আমাদের অ্যামোনিয়া নিয়েও চিন্তা করতে হবে।'

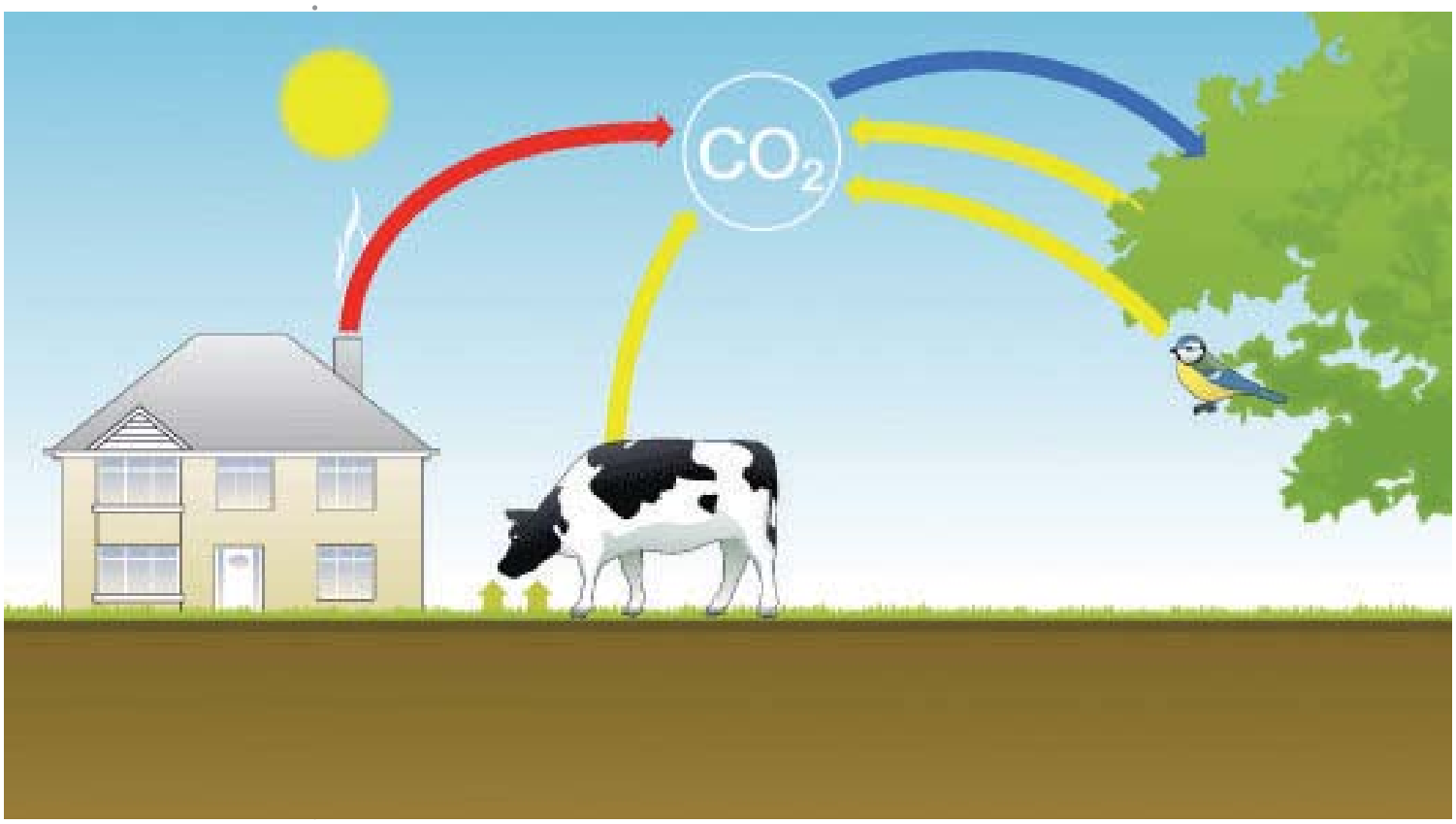


বিতর্ক বিভাগে যোগ দিতে হলে jugasankha.suppli@gmail.com আইডি-তে মেইল করে জানান।

যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭

## ক্যুইজ

১) মানবদেহের সবচেয়ে ছোট কোষ কোনটি?
২) ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট কে চালু করেন?
৩) রণ কাকে বলা হয়?
৪) কলিচুনের জলীয় দ্রবণকে কী বলে?
৫) আক্সাই চিন কী?
৬) পাশ্চাত্য শিক্ষার উগ্র সমর্থক কে ছিলেন?
৭) আর্কিমিডিসের নীতি প্রয়োগ করে কী করা যায়?
৮) পর্বতের ঢালে ধাপ কেটে ভূমি সংরক্ষণের পদ্ধতিকে কী বলে?
৯) ব্লিচিং পাউডারের রাসায়নিক নাম কী?
১০) জৈন সাহিত্য কোন ভাষায় লেখা?
১১) তামাক চাষের জন্য কেমন মাটি প্রয়োজন?
১২) ব্রোঞ্জ কীভাবে প্রস্তুত হয়?
১৩) বেঞ্জিনের বাণিজ্যিক নাম কী?
১৪) পাহাড় সম্পর্কিত বৃষ্টিপাতকে কী বলে?
১৫) জলের চেয়ে হালকা ধাতু কী?
১৬) পাটলিপুত্র নগরী কে স্থাপন করেন?
১৭) ভারতের কোথায় জাফরান উৎপাদন হয়?
১৮) সালোকসংশ্লেষকারী অঙ্গাণুর নাম কী?
১৯) প্রাণীজ প্রোটিনকে কোন শ্রেণির প্রোটিন বলা হয়?
২০) নিমপাতা তেতো হয় কেন?
২১) বৈদিকযুগে ধনী বণিকদের কী বলা হত?
২২) সিলিকোসিস রোগ কাদের বেশি হয়?
২৩) ভারতে কোন লেকের জল সবচেয়ে বেশি লবণাক্ত?
২৪) শ্বেতসার জাতীয় খাদ্যকে কী বলা হয়?
২৫) এঞ্জেল জলপ্রপাত কোথায় আছে?
২৬) পশ্চিমবঙ্গের শুষ্কতম জেলা কোনটি?
২৭) কোন দেশের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ভারত চুখা জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তুলেছে?
২৮) ভোরাঘাট পাস কোথায় আছে?
২৯) সাগর সম্রাট কী?
৩০) ফ্যাটজাতীয় খাদ্যের প্রধান কাজ কী?
৩১) কম্বোজ শ্রেণির প্রাণীদের রক্তরসে কী থাকে?
৩২) কোষের কোথায় অবাত শ্বসন ঘটে?
৩৩) হিন্দু আইন 'দায়ভাগ'-এর রচয়িতা কে?
৩৪) পরাশ্রয়ী উদ্ভিদের বায়বীয় আবরণকে কী বলে?
৩৫) যেসব পদার্থ থেকে ভিটামিন সংশ্লেষিত হয়, তাকে কী বলে?
৩৬) মিশরের বৃহত্তম জলাশয়ের নাম কী?
৩৭) কাকে চার্নোজেম বলা হয়?
৩৮) গারো পাহাড়ের উচ্চতম চূড়ার নাম কী?
৩৯) ফিউজ তার কী দিয়ে তৈরি হয়?
৪০) তৈমুর লঙ কোন বংশীয় ছিলেন?
৪১) আকবরের মায়ের নাম কী ছিল?
৪২) কোন উদ্ভিদে পত্ররন্ধ্র থাকে না?
৪৩) শীলভদ্র কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন?
৪৪) চামড়া দিয়ে আবৃত বাদুরের ডানাকে কী বলে?
৪৫) পরজীবীরা যার উপর জন্মায় তাকে কী বলে?
৪৬) প্রাণীজ শ্বেতসারের অন্যনাম কী?
৪৭) ব্রাজিলের ক্রান্তীয় মরুভূমিকে কী বলে?

৪৮) ভারতের দীর্ঘতম হিমবাহের নাম কী?

**উত্তর:** ১) শ্বেতকণিকা। ২) লর্ড লিটন। ৩) গুজরাটের অগভীর জলাভূমিকে। ৪) চুন-জল। ৫) উচ্চ মালভূমি। ৬) টমাস মেকলে। ৭) পদার্থের ঘনত্ব ও অসম আকৃতিবিশিষ্ট বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায়। ৮) টেরাসিং। ৯) ক্যালসিয়াম ক্লোরোহাইপো ক্লোরাইট। ১০) অর্ধমাগধী। ১১) পটাশ সমৃদ্ধ। ১২) তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে। ১৩) বেঞ্জল। ১৪) অরোগ্রাফিক বৃষ্টিপাত। ১৫) সোডিয়াম। ১৬) উদয়ভদ্র। ১৭) ভারতের কোথায় জাফরান উৎপাদন হয়? জম্মু ও কাশ্মীরে। ১৮) ক্লোরোপ্লাস্ট। ১৯) প্রথম শ্রেণির। ২০) শতকরা ১০০ ভাগ শর্করা থাকার জন্য। ২১) শ্রেষ্ঠী। ২২) খনি শ্রমিকদের। ২৩) সম্বর লেকের। ২৪) প্রোটিন বাঁচোয়া খাদ্য। ২৫) ভেনেজুয়েলা। ২৬) পুরুলিয়া। ২৭) ভুটান। ২৮) মহারাষ্ট্র। ২৯) তৈলকূপ খননকারী জাহাজ। ৩০) তাপশক্তি উৎপাদন করা। ৩১) হিমোসায়ানিন। ৩২) সাইটোপ্লাজমে। ৩৩) জীমূতবাহন। ৩৪) ভেলামেন। ৩৫) প্রোভিটামিন। ৩৬) লেক নাসের। ৩৭) ইউক্রেনের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চলকে। ৩৮) নক্রেক। ৩৯) টিন ও সিসার সংকর ধাতু দিয়ে। ৪০) চাঘতাই তুর্কি। ৪১) হামিদাবানু। ৪২) জলে নিমজ্জিত উদ্ভিদে। ৪৩) নালন্দা। ৪৪) প্যাটাজিয়াম। ৪৫) পোষক। ৪৬) গ্লাইকোজেন। ৪৭) সাভানা। ৪৮) সিয়াচেন।

## বিতর্ক যখন শিক্ষা নিয়ে

### আজকের বিষয়:

# পাস-ফেল প্রথা

শিক্ষাব্যবস্থায় পাশ-ফেল প্রথা থাকবে কি থাকবে না বর্তমানে এটি একটি বহুচর্চিত বিষয়। একাংশের মতে এই প্রথা থাকা দরকার আবার অনেক মানুষের মতে এই প্রথা বিরূপ প্রভাব ফেলছে শিশুমনে। ছোট থেকেই আমরা স্কুল মানেই পড়াশোনা, খেলাধুলা, ক্লাসের নিয়মিত হোমওয়ার্ক করে স্কুলে যাওয়া এবং বছরের শেষে বার্ষিক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে জীবনে বড় হয়েছি। পরীক্ষা কাছে এগিয়ে আসতেই স্বাভাবিকভাবে মনে আলাদা করে উত্তেজনা তৈরি হত যে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট করে ক্লাসে উঠতে হবে। নতুন বই নতুন ক্লাস, সেইসঙ্গে ছিল ভালো করে পড়া না করলে অকৃতকার্য হওয়ার ভয়। অন্যান্য বন্ধুরা ক্লাসে উঠে যাবে, আর আমি পুরনো ক্লাসে পড়ে থাকব সেই পরিস্থিতি থেকে পড়ার তাগিদ বাড়ত। আরও মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা শুরু হত। নিয়মিত পড়াশোনা একটি জরুরি বিষয়ের মধ্যে পড়ে। এতে পড়াশোনার মান আরও উন্নত হয়।

স্কুল জীবনই আমাদের জীবনের ভিত। শুধু স্কুলে যাওয়া-আসা নয়, নিয়মিত পড়াশোনা করা, সময়মতো হোমওয়ার্ক তৈরি করা, আর পরীক্ষার সময় পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের জন্য প্রতীক্ষা করা— এই সব জীবনের একটি আলাদা পাঠ।

কিন্তু বর্তমানে পাস-ফেল প্রথা আমাদের কাছেই একটি প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠছে। যে সমস্যাটি আরও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে সেটি হল, স্কুলে উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে। তাদের মনে হচ্ছে নবম শ্রেণিতে গিয়ে আমরা সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাবনাচিন্তা করব। ফলে পড়াশোনার গুণগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে তারা। এই ধরনের চিন্তাভাবনা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রধান উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে শিক্ষিকাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে ক্লাসে তুলতে হচ্ছে। ফলে একদিকে যেমন সেই অকৃতকার্য পড়ুয়াটি প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর কাঁচা থেকে যাচ্ছে তেমনি দুর্বল পড়ুয়াটি নতুন ক্লাসে খুব সহজেই উঠে যাওয়ার ফলে সে পড়াশোনার গুরুত্ব বুঝে উঠতে পারছে না। পরীক্ষার খাতায় একজন ছাত্রী যেভাবে উত্তর লিখুক না কেন, তাকে নম্বর দিতেই হবে এই পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। এতে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে একজন পড়ুয়ার। অচিরে ক্ষতি হচ্ছে সমাজের।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এখন শুরু হয়েছে প্রথা অনায়াসে তারা পরীক্ষার খাতায় নম্বর তুলতে সক্ষম। যেখানে এখন মগজের পরিশ্রম কম হয়। আবার আর অষ্টম শ্রেণি পাস করেই সার্টিফিকেট চলে আসছে হাতে। সেই সার্টিফিকেটে কাজ চলে যাবে। তাহলে কেন আমি পরিশ্রম করব, কেন আমি খাটব এই মানসিকতা দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তাই বর্তমান প্রজন্মের কীভাবে ভালো হয় সেটা একজন শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও সরকার সকলের ভাবার সময় হয়তো এসেছে।

**জয়া বিশ্বাস (শিক্ষিকা)**

অবশ্যই পাস-ফেল প্রথা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। আমরা যখন একজন পড়ুয়াকে কোনও কিছু শেখাই, তার যোগ্যতা বিচার করার জন্য একটি পরীক্ষার প্রয়োজন হয়। তার আগ্রহ বাড়ানোর জন্য আমাদের তাকে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। পাস-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ার ফলে যে সমস্যাটি দাঁড়াচ্ছে সেটি হল অনেকক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই একজন অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া ভালোভাবে তার নাম সই করতে পারছে না। তবে অনেকে হয়তো বলতে পারেন পাস-ফেল বলবৎ থাকলে ছাত্র-ছাত্রী অকৃতকার্য হলে তার মধ্যে অবসাদ আসতে পারে বা সে আত্মহননের পথ বেছে নিতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয়, এই ধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা খুব কম। সেক্ষেত্রে সেই পড়ুয়ার সঠিকভাবে কাউন্সেলিং করলে এই ধরনের সমস্যা এড়ানো সম্ভব। পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও এই ব্যাপারে অনেক সচেতন হওয়া উচিত। কিন্তু পাস-ফেল প্রথা তুলে দেওয়ার ফলে বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রীর প্রকৃত শিক্ষার মূল্যায়ন হচ্ছে না। পিছিয়ে পড়ছে তারা।

**সাথী হালদার (দশম শ্রেণি)**

পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাস-ফেল প্রথা তুলে দেওয়াকে আমি সমর্থন করি না। কারণ অকৃতকার্য হওয়ার ভয় ও পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দুটি-ই খুব জরুরি। নিজের বন্ধুদের মধ্যে দেখি এই প্রথা উঠে যাওয়ার কারণে পড়াশোনা না করার প্রবণতা তৈরি হয়েছে। এই অভ্যাস নবম-দশম শ্রেণিতেও বজায় রাখে তারা। তখনও ওদের মুখে খালি একটাই কথা শুনি পড়তে ভালো লাগে না। পড়াশোনার অভ্যাস না থাকার কারণে তাদের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের অভ্যাস বাড়ছে।

নবম, দশম শ্রেণিতে পড়াশোনার চাপ বেশি ফলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা পিছিয়ে পড়ছে। রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে। বন্ধুরা অকৃতকার্য হলে নিজেদেরও খুব খারাপ লাগে। অনেকের মধ্যে একটা গা-ছাড়া মনোভাব তৈরি হওয়ার পাশাপাশি পড়ব না এই অভ্যাস তৈরি হয় দেখে খারাপ লাগে। পরবর্তী পর্যায়ে তারা আর নতুন করে পড়াশোনায় মন বসাতে পারে না। যেখান থেকে তাদের মধ্যে সমস্যা তৈরি হয়।

**রিমা সাহা (অভিভাবক)**

পাস-ফেল প্রথা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ একজন পড়ুয়ার কাছে এর গুরুত্ব অপরিসীম। চারদিকে নানা ধরনের প্রলোভনের যুগে বাচ্চারা এখন এমনিতেই পড়াশোনায় মন দিতে চায় না। পড়াশোনা না করে এমনিতেই ক্লাসে উঠে যাব এই মানসিকতা তৈরি হয়েছে। এই কারণে পরের দিকে তাদের সামনে আরও সমস্যা তৈরি হচ্ছে। নবম শ্রেণিতে ওঠার পর তারা অসুবিধার মধ্যে পড়ছে।

যারা ছোট থেকেই পড়াশোনা না করেই অভ্যস্ত থাকবে নবম শ্রেণিতে উঠে তাদের মধ্যে একই অভ্যাস বজায় থাকছে। তাই এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে মনে করি শিক্ষার মান উন্নতির জন্য প্রতিটি ক্লাসে পাস-ফেল প্রথা চালু থাকা খুবই দরকার। একজন পড়ুয়া অকৃতকার্য হবে সেটা বাঞ্ছনীয় নয়, কিন্তু এই প্রথা চালু থাকলে ছাত্রছাত্রীরা মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। ভালো ফল করব এই মানসিকতা নিয়ে নিজেকে তৈরি করবে।

**উত্তরণ-এর মুখোমুখি: রোল নং ওয়ান**

**প্রত্যেক স্কুলের ফার্স্টবয় ও ফার্স্টগার্ল-রা এই বিভাগে যোগ দিতে পারো।**

ফোন: 033 40605837 (১২টা থেকে ৬টা), ই-মেইল: jugasankha.suppli@gmail.com

**স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও পাঠান**

**শিক্ষাগুরুর পরামর্শ**

উত্তরণ
যুগশঙ্খ SUPPLI
মঙ্গলবার, ১৩ জুন ২০১৭
উত্তরণের
জেনারেল নলেজ

তোমাদের কেমন লাগছে, মেইল করে জানাও আমাদের।



# রোলস রয়েস গাড়ির ইতিহাস

**বিদিশা রায়চৌধুরী**

বিশ্বজুড়ে সমাদৃত দ্রুতগতির এবং বিলাসবহুল গাড়ি উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের রোলস রয়েস অন্যতম। ১৯০৬ সালের ১৫ মার্চ চার্লস স্টুয়ার্ট রোলস রয়েস কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন। গাড়ি তৈরির পাশাপাশি বিমানের ইঞ্জিন তৈরির কাজেও জড়িয়ে পড়ে কোম্পানিটি। একসময় ব্রিটেনের রাজা-রানিরা ব্যবহার করতেন এই বিলাসবহুল রোলস রয়েস গাড়ি। তখন এসব গাড়ির দাম ছিল আকাশচুম্বী। বছরে মাত্র পাঁচশোটি গাড়িই তৈরি হত। এখনও কিন্তু রোলস রয়েসের দাম অনেক। রোলস রয়েসের রেইথ সিরিজের সর্বশেষ গাড়িগুলোর দাম প্রায় সোয়া তিন লক্ষ মার্কিন ডলার বা ভারতীয় মুদ্রায় আড়াই কোটি টাকারও বেশি। আর এ ধরনের বিলাসবহুল গাড়ির ক্ষেত্রে ভারতে একশো শতাংশ আমদানি শুল্কও দিতে হয়। মানে দাম দাঁড়াচ্ছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা।

অভিজাতদের গাড়ি রোলস রয়েস

উচ্চমূল্যের কারণে সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরেই থাকে রোলস রয়েস। অন্যদিকে, অভিজাতদের প্রতীক হয়ে ওঠে অভিজাত শ্রেণির মাঝে এই গাড়িটি। ব্রিটেনের রাজা পরিবার ডেইলমারের গাড়ি ব্যবহার করত। কিন্তু দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য তথা পরম্পরা ভেঙে পঞ্চাশের দশক থেকে তাঁরা রোলস রয়েসের দিকে ঝুঁকে পড়েন। রাজকন্যা এলিজাবেথ (ব্রিটেনের পরবর্তী রানি) দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ভেঙে রোলস রয়েসের ফ্যান্টম-ফোর সিরিজের গাড়ি ব্যবহার করতে শুরু করেন। গাড়িটি রাজপরিবার এবং রাষ্ট্রপ্রধানদের জন্যই বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছিল। ফ্যান্টম-ফোর সিরিজের এই গাড়িগুলো পৃথিবীর অন্যতম দুর্লভ গাড়ি, মাত্র ১৮টি তৈরি হয়েছিল এই ধরনের গাড়ি।

১৯৫৫ সালে সিলভার ক্লাউড সিরিজের গাড়ি নিয়ে আসে রোলস রয়েস। ৪,৮৮৭ সিসি ইঞ্জিনের এই গাড়িগুলো ঘণ্টায় ১০৬ মাইল বেগে চলতে পারত। এই দশকের শেষ দিকেই আসে ফ্যান্টম-ফাইভ গাড়ি, যা ফ্যান্টম-ফোর এর চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি হয়েছিল। ষাটের দশকে এসে রোলস রয়েসের আবেদন আরও বেড়ে যায়। রুপোলি পর্দার তারকায় পরিণত হয় রোলস রয়েস। অভিনেতা-অভিনেত্রী, পপ তারকা সহ সেলিব্রিটিরা রোলস রয়েস ব্যবহার করতে শুরু করেন। এদের মধ্যে ছিলেন জন লেলন, রেক্স হ্যারিসন এবং ইনিগ্রিড বার্গম্যান প্রমুখ সেলিব্রিটিরা।

যেভাবে রোলস রয়েস বিএমডব্লিউ-র হাতে চলে গেল

১৯৭৩ সালে গাড়ি উৎপাদন বিভাগটি আলাদা করে রোলস রয়েস মোটরস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিক্রি করে দেয় ব্রিটিশ সরকার। এটি করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, যাতে জেট ইঞ্জিনের কাজে মনোযোগ দিতে পারে। এরপর ১৯৮০ সালে রোলস রয়েস মোটরকে অধিগ্রহণ করে ভিকারস। ১৯৯৮ সালে ভিকারসের কাছ থেকে রোলস রয়েসকে কিনে নেয় ভক্সওয়াগন, আর ২০০২ সালে আবার মালিকানা বদল হয়। এবার রোলস রয়েসকে কিনে নেয় বিএমডব্লিউ।

১৯৮৮ সালেই রোলস রয়েসকে কিনতে চেয়েছিল বিএমডব্লিউ। কিন্তু বেশি দর হেঁকে ভক্সওয়াগনই রোলস রয়েস মোটরর্স-এর মালিকানা পেয়ে যায়। এদিকে গাড়ির অন্তর্দহ ইঞ্জিনের জন্য তখন বিএমডব্লিউ-এর ওপরই নির্ভরশীল ছিল রোলস রয়েস।

চুক্তি জটিলতা: চুক্তি অনুযায়ী ঐতিহাসিক 'ক্রু ফ্যাক্টরি', 'স্পিরিট অব এক্সটাসি' মাসকট এবং রেডিয়েটর গ্রিলের স্বত্ব পেয়ে যায় ভক্সওয়াগন। কিন্তু রোলস রয়েসের ব্র্যান্ড নেম এবং লোগো তখনও মূল রোলস রয়েস কোম্পানির হাতে। মূল কোম্পানিটির সঙ্গে কিছু অংশীদারিত্বমূলক কর্মকাণ্ডের কারণে রোলস রয়েস লোগো এবং ব্র্যান্ড নেম কিনতে সক্ষম হয় বিএমডব্লু। এক ধরনের অচলাবস্থার

উপক্রম হয়। করণ স্বত্ব, মাসকট এবং রেডিয়েটর গ্রিলের নকশা ভক্সওয়াগনের হাতে থাকলেও, ব্র্যান্ড নেম এবং লোগো ছিল বিএমডব্লিউ-এর কাছে। ইঞ্জিন সরবরাহের কাজটিও করত বিএমডব্লিউ। ১২ মাসের নোটিশে ইঞ্জিন সরবরাহ বন্ধ করার সুযোগ ছিল বিএমডব্লিউর। এত কম সময়ে রোলস রয়েস গাড়ির জন্য নতুন করে ইঞ্জিনের নকশা তৈরি করা সম্ভব ছিল না। এ সময় ভক্সওয়াগন বলে, তারা শুধু বেনলি ব্র্যান্ডটি (রোলস রয়েসের মালিকাধীন ব্র্যান্ড) চেয়েছিল যা বাজারে রোলস রয়েসের চেয়ে বেশি বিক্রি হচ্ছিল।

দর কষাকষির পর ভক্সওয়াগন এবং বিএমডব্লিউ একটি সমঝোতায় আসে। ১৯৯৮ থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত বিএমডব্লিউ ইঞ্জিন সরবরাহ করে। ভক্সওয়াগন রোলস রয়েসে নাম এবং লোগো ব্যবহার করার অনুমতিও পায়। ২০০৩ সালের জানুয়ারি থেকে বিএমডব্লিউ রোলস রয়েসের উৎপাদনের কাজে হাত দেয়। অন্যদিকে, 'ক্রু ফ্যাক্টরি' বেনলি মোটরস লিমিটেডের ফ্যাক্টরিতে পরিণত হয়। রোলস রয়েস মোটরর্স-এর নতুন কারখানা চালু হয় গুডউড-এ।

রোলস রয়েস গাড়ির ব্র্যান্ডগুলোর মধ্যে রয়েছে ফ্যান্টম, গোস্ট এবং রেইথ সিরিজ।

রোলস রয়েস রেইথ সিরিজ

- রোলস রয়েস রেইথ সিরিজের সর্বশেষ গাড়িগুলোয় আছে ৬২৪ হর্সপাওয়ার ক্ষমতার ৬.৬ লিটার ভি-১২ ইঞ্জিন। ফলে মাত্র এক মিনিটেই ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগ তুলতে পারে গাড়িটি।
- জিপিএস প্রযুক্তির মাধ্যমে গাড়ির অবস্থান নির্ণয় করে সামনের পথের নির্দেশনা দেওয়ার পাশাপাশি রাস্তার ধরন বুঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এটি।
- মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করা যায়, এ যেন ভৃত্য, যে মৌখিন নির্দেশে কাজ করে।
- ভেতরে ছাদের অংশেও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। এখানে মোলায়েম এবং এক হাজারেরও বেশি ফাইবার অপটিক ল্যাম্প রয়েছে। রাতে গাড়িতে চড়ার সময় মনে হবে আপনি আকাশের নিচে বসে তারা দেখছেন।

রোলস রয়েস নিয়ে মজার কয়েকটি তথ্য

- দশ হর্সপাওয়ারের প্রথম রোলস রয়েস গাড়ির দাম ছিল মাত্র ৩৯৫ পাউন্ড। আর এখন সেটির দাম আড়াই লক্ষ পাউন্ডেরও বেশি।
- এ পর্যন্ত তৈরি হওয়া রোলস রয়েস গাড়িগুলোর ৬৫ শতাংশই সচল রয়েছে।
- রোলস রয়েসের রেডিয়েটর গ্রিল পুরোপুরি হাতে তৈরি করা হয়।
- রেডিয়েটর তৈরি করতে একজনের পুরো একদিন লেগে যায়। আর সেটি পালিশ করে লাগে ঘণ্টা পাঁচেক।
- ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত ট্রেডমার্ক হিসেবে রেজিস্ট্রেশন করা ছিল না রোলস রয়েস।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রাইফেলও তৈরি করেছে কোম্পানিটি।
- ফ্যান্টম সিরিজের একটি গাড়ি তৈরি করতে সময় লাগে প্রায় দু'মাস।
- রোলস রয়েস গাড়ির সামনে হুডের ওপর স্থাপিত মাসকটটি কোনও সংঘর্ষের সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভেতরে ঢুকে যায়।